সংবাদ

তারিখ ... ২৩ FEB ...
পৃষ্ঠা ৩ ... কলাম ৩ ...

আদিবাসী মাতৃভাষায় পাঠ্যপুস্তক এবং শিক্ষাদান

মিথুশিলাক মুরমু

বিগত বছরের ডিসেম্বর ২৮, ২০১৬ খ্রিষ্টাব্দে রাজশাহীর গোদাগাড়ী বর্ষাপাড়া পরিদর্শন করি, অবশ্য ইতোপূর্বেও কয়েকবার এই আলোচিত বিদ্যালয়টি পরিদর্শন করেছি। বর্ষাপাড়ার পার্শ্ববর্তী গ্রাম নিমঘুটুতে থাকেন রেভারেন্ড বিকাশ সরেন, তিনি চার্চ অফ বাংলাদেশ-এর একজন পুরোহিত এবং বীরমুক্তিযোদ্ধা। দীর্ঘ সময় তার সাথে আলাপ-আলোচনা হয় এবং এক পর্যায়ে, বর্ষাপাড়ায় আদিবাসী সাঁওতালদের জন্য নির্মিত মাতৃভাষায় শিক্ষাদানে নিয়োজিত বিদ্যালয়ের বিষয়টি উত্থিত হয়। রেভারেণ্ড বিকাশ সরেন আমাকে জানালেন, তাদের উদ্যোগটি সত্যিই প্রশংসনীয় হলেও সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে। ছেলেমেয়েরা বিদ্যালয়ে গমনাগমন করলেও এখন সেখানে আর মাতৃভাষায় পড়ানো সম্ভবপর হচ্ছে না, পড়াশোনার মানও খুব একটা সন্তোষজনক নয়। ১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দে মডেল হিসেবে প্রাক-প্রাথমিক স্তরের বিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু করে কোনো প্রভাব ফেলতে পারেনি। বর্ষাপাড়াতে সাঁওতালী ভাষার বাংলা বর্ণমালাতে লেখাপড়া প্রচেষ্টা চালানো হয়েছিল কিন্তু সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর অধিকাংশ সচেতন ব্যক্তিবর্গ সাঁওতালী ভাষার রোমান বর্ণমালাকে গ্রহণ, চর্চা এবং অদূর ভবিষ্যতের প্রজন্মসমূহের কাছে পরিচিত করে তোলার প্রয়াস গ্রহণ করায় বাংলা বর্ণমালাকে আপন করে নিতে পারেনি। আজ থেকে প্রায় ৩৬ বছর আগে ১৯৮০ খ্রিষ্টাব্দে 'Santal Education Center' দিনাজপুর থেকে প্রাথমিক পর্যায়ের ছেলেমেয়েদের সাঁওতালী ভাষায় অক্ষরজ্ঞান প্রদানের লক্ষ্যে পাঠ্যপুস্তক 'Badaejon Hor-Pahil Puthi' (বঙ্গানুবাদ-'জেনে নেওয়ার রাস্তা-প্রথম পুথি') প্রস্তুত করেছিলেন শ্রী যোসেফ সরেন, শ্রী বেঞ্জামিন সরেন এবং Bjrn Roar Bye. ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের উপযোগী এবং আদিবাসী সাঁওতালী বান্ধব কার্টুন এঁকেছিলেন Julie Warren. সতর্কভাবে লক্ষ্য করেছি, ১৯৮০ খ্রিষ্টাব্দে পাঁচ হাজার এবং ১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দে পাঁচ হাজার কপি ছাপানো হয়েছে। আমাদের তৎকালীন ছেলেমেয়েরা এরূপ বেশ কয়েকটি পাঠ্যপুস্তক অনুসরণ করে সাঁওতালী ভাষা পড়তে, লিখতে এবং শুদ্ধ উচ্চারণ রপ্ত করতে পেরেছিলেন। অতঃপর প্রায় তিন যুগ অতিক্রম করার পরও উত্তরবঙ্গের বৃহত্তম আদিবাসী জনগোষ্ঠী সাঁওতালদের মধ্যে বর্ণমালা বির্তকের সমাধান বা ফয়সলা সম্ভবপর হয়নি।

গত বছরের সেপ্টেম্বর ২১-২৪ তারিখ পর্যন্ত কক্সবাজার মালুমঘাটে অবস্থান করছিলাম। সেখানে পূর্ব পরিচিত ত্রিপুরা লেখক, গবেষক এবং ধর্মশিক্ষক পাষ্টর সত্যরাম ত্রিপুরা'র সাথে বেশ কয়েকটা দিন নিবিড়ভাবে মেলামেশার সুযোগ হয়েছিল। ২৩ সেপ্টেম্বর বান্দরবান সদরে উসুই গোষ্ঠীর ত্রিপুরাদের সভা অনুষ্ঠিত হয়। ত্রিপুরা'রা কয়েকটি ক্ল্যানে বিভক্ত-উসুই, ককবরক, রিয়াং, দেববর্মন, ফাইতং ইত্যাদি। ত্রিপুরাদের আবার গোত্রানুযায়ী ভাষার তারতম্যও রয়েছে বেশ। সেদিন আলোচনায় বান্দরবানের উসুই ত্রিপুরা'রা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, ত্রিপুরাদের জন্য যে পবিত্র বাইবেল প্রণীত হতে হচ্ছে; সেটি হবে অবশ্যই রোমান বর্ণমালায়। রোমান বর্ণমালাতেই ভাষার শ্রুতিমধুর, সৌন্দর্য এবং ভাব প্রকাশের লিখিতরূপটি পরিপূর্ণ হয়ে থাকে। ২০০৮ খ্রিষ্টাব্দে বান্দরবানেই তিন পার্বত্য জেলার ত্রিপুরাদের সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেবারই একপ্রকার সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে, অঞ্চলভেদে কিংবা গোষ্ঠীভেদে ভাষার ভিন্নতা হলেও রোমান বর্ণমালা হবে তাদের সার্বজনীন বর্ণমালা এবং কমন ভাষা হবে ককবরক ভাষা। ব্রাদার মন্তজয় ত্রিপুরা নিজ জনগোষ্ঠীর জন্য স্বতন্ত্র বর্ণমালা আবিষ্কার করেছিলেন কিন্তু সেটিকে গ্রহণ করা হয়নি। একটি নতুন বর্ণমালাকে পরিচয় করানো এবং সেই বর্ণমালাতে পাঠ্যপুস্তক তৈরি কিংবা শব্দভাণ্ডার সংরক্ষণ কঠিন হয়ে পড়বে; এইজন্য তারা নতুন চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেননি। ইউএনডিপি'র অর্থায়নে তিন পার্বত্য জেলার তিনটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান 'জাবারাং', 'সাস' এবং 'তৈমুর'-কে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। 'সেভ দ্যা চিলড্রেন' এবং 'সীল বাংলাদেশ'-এর প্রচেষ্টায় ১৭ জন (বান্দরবান থেকে ৫, রাঙ্গামাটি থেকে ৪ এবং খাগড়াছড়ি থেকে ৯ জন) লেখক, গবেষক প্রাণান্ত প্রচেষ্টায় ত্রিপুরাদের প্রাক-প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক প্রণীত হয়েছে। দীর্ঘদিন পরিশ্রমের ফসল হচ্ছে ত্রিপুরাদের মাতৃভাষায় পাঠ্যপুস্তক।

পহেলা জানুয়ারিকে 'পাঠ্যপুস্তক উৎসব' হিসেবে যখন উদ্‌যাপন করা হচ্ছে, এ দিনই রাঙামাটির আদিবাসী ছেলেমেয়েরাও প্রথম মাতৃভাষায় পাঠ্যপুস্তক হস্তগত হয়েছেন। অপরদিকে প্রায় ২৫ দিন পর অভিযোগ উত্থিত হয়েছে 'মাতৃভাষায় বই পায়নি খাগড়াছড়ির ক্ষুদ্র জাতিসত্তার শিক্ষার্থীরা' (প্রথম আলো ২৪.১.২০১৭)। বিগত কয়েক বছর থেকেই ৬টি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর (চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, গারো, উরাঁও এবং সাঁওতাল) মাতৃভাষায় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের কাজ জোরেশোরে চলছিল। আদিবাসী সাঁওতালদের ব্যতীত অন্য জনগোষ্ঠীর পাঠ্যপুস্তক সংক্রান্ত বেশ কয়েকবার আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং শেষান্তে পাঠ্যপুস্তক আলোর মুখ উদ্ভাসিত হয়েছে। রাঙামাটির ১০টি উপজেলার চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা শিশুর প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত নিজস্ব ভাষায় ১২ হাজার ৮৩১টি পাঠ্যপুস্তক ও অনুশীলন খাতা বিতরণ করা হয়েছে। দুর্বলতা স্বীকার করে রাঙামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান বৃষকেতু চাকমা বলেছেন, 'এ বছর রাঙামাটি জেলায় সব প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর শিশুদের নিজ মাতৃভাষায় পাঠ্যপুস্তক দেয়া সম্ভব না হলেও আগামী বছর থেকে দেওয়া হবে। এই শিশুদের পাঠদানের জন্য প্রাথমিক পর্যায়ে কিছু শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। পর্যায়ক্রমে সব শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।' খাগড়াছড়ি জেলার প্রাথমিক শিক্ষা কার্যালয় সূত্রানুযায়ী, ২০১৭ শিক্ষাবর্ষে প্রাক-প্রাথমিকের ক্ষুদ্র জাতিসত্তার শিক্ষার্থীদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে ২৬ হাজার ৫০০ পাঠ্যপুস্তকের চাহিদা দেওয়া হয়েছে। চাকমা শিক্ষার্থীদের জন্য ৩ হাজার ৮৩৩টি, মারমা সম্প্রদায়ের জন্য ১ হাজার ৯৭০টি, ত্রিপুরা সম্প্রদায়ের জন্য ১ হাজার ৬২২টি ও গারো সম্প্রদায়ের জন্য ৯টি খাতা এবং চাকমা ও মারমা সম্প্রদায়ের মাতৃভাষার শিক্ষার্থীদের জন্য ১ হাজার ২০০টি শিক্ষক নির্দেশিকা পাওয়া যায়। এখন পর্যন্ত বই সরবরাহ করা হয়নি। চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা ও গারো আদিবাসীদের মাতৃভাষায় শিক্ষা কার্যক্রম চালানোর জন্য শুধু খাতা ও শিক্ষক নির্দেশিকা সরবরাহ করা হয়েছে। খাগড়াছড়ি জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ফাতেমা মেহের ইয়াসমীন আশাবাদ ব্যক্ত করে স্বীকার করেছেন,'শিগগিরই পাঠ্যপুস্তক আসবে বলে তারা আশা করছেন।' দেশের উত্তরবঙ্গের চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলার অনেক বিদ্যালয়েই শিশু শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক পৌঁছায়নি। ঢাকায় আমাদের ছেলেমেয়েরা খ্রিষ্টান ধর্মের বই এখন পর্যন্ত হাতে পায়নি।

আদিবাসীদের মাতৃভাষায় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার দাবি-দাওয়া ও বপ্র কয়েক দশক পূর্বেই দেখেছিলেন। জাতীয় আদিবাসী পরিষদ ১৯৯৩ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই দাবি করে আসছেন-'...বাংলা, ইংরেজির পাশাপাশি আদিবাসীদের মাতৃভাষায় পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষাদানের ব্যবস্থা চালু করতে হবে।' ১৯৯৭ খ্রিষ্টাব্দের ২ ডিসেম্বর সম্পাদিত পার্বত্য চুক্তিতে পাহাড়ের আদিবাসী শিশুদের বিদ্যালয় থেকে ঝরেপড়া রোধে প্রাক-প্রাথমিক স্তরে নিজ নিজ মাতৃভাষায় শিক্ষা পদ্ধতি চালুর কথা বলা হয়েছে। ১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দে বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম কর্তৃক ঘোষণাকৃত শিক্ষা শিরোনামে বলা হয়েছে-১. আদিবাসীদের স্ব স্ব মাতৃভাষায় শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা; ২. অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা; ৩. শিক্ষা ক্ষেত্রে জোরদার করা, দক্ষতা বৃদ্ধি বা পেশাগত প্রশিক্ষণে আদিবাসীদের অগ্রাধিকার প্রদান করা। বোধ করি, সেই ধারাবাহিকতার ফলস্বরূপ ২০১০ খ্রিষ্টাব্দে প্রণীত জাতীয় শিক্ষানীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বলা হয়েছে-২৩. দেশের আদিবাসীসহ সকল ক্ষুদ্রজাতিসত্তার সংস্কৃতি ও ভাষার বিকাশ ঘটানো। খ. প্রাথমিক শিক্ষা উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বলা হয়েছে- প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে আদিবাসীসহ সকল ক্ষুদ্র জাতিসত্তার জন্য স্ব স্ব মাতৃভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করা। 'আদিবাসী শিশু' শীর্ষক ধারাগুলোতে- ১৮. আদিবাসী শিশুরা যাতে নিজেদের ভাষা শিখতে পারে সেই লক্ষ্যে তাদের জন্য আদিবাসী শিক্ষক ও পাঠ্যপুস্তকের ব্যবস্থা করা হবে। এই কাজে, বিশেষ করে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে, আদিবাসী সমাজকে সম্পৃক্ত করা হবে। ১৯. আদিবাসী প্রান্তিক শিশুদের জন্য বিশেষ সহায়তার ব্যবস্থা করা হবে। ২০. আদিবাসী অধ্যুষিত (পাহাড় কিংবা সমতল) যেসকল এলাকায় প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই সেসকল এলাকায় প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করা হবে। যেহেতু কোনো কোনো এলাকায় আদিবাসীদের বসতি হালকা তাই একটি বিদ্যালয়ে পর্যাপ্ত শিক্ষার্থী ভর্তি হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের আবাসিক ব্যবস্থার প্রয়োজন হলে সেদিকেও নজর দেয়া হবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা'র বাণী প্রত্যেক শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকের শেষ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। বলা হয়েছে-'সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য যোগ্যতা অর্জন কর'। আদিবাসীরা অনগ্রসর, পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী নিঃসন্দেহে বলা যায়। পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর হাতে সর্বাগ্রে পাঠ্যপুস্তক নিশ্চিত করা সম্ভব হলেই 'পাঠ্যপুস্তক উৎসব'-এর যথার্থতা, সার্থকতা হবে। মহানগর, নগর, শহরাঞ্চল উৎসবের বৈষম্য বৃত্তে যেন আমরা আটকা না পড়ি। অজো পাড়াগাঁয়ের বিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তক পৌঁছানোর প্রচেষ্টা, আকাঙ্ক্ষা এবং স্বপ্ন থাকলে সেটি বাস্তবেও রূপায়িত করা যায়। আর সেটি সম্ভবপর হলেই শিক্ষার জন্য শিক্ষা'র যে প্ল্যাকার্ড, স্লোগান সরকার তুলে দিয়েছেন আমাদের হাতে; সেটি সত্যিতে পরিণত হবে।